প্রবন্ধ

প্রান্তিক থাকা না-থাকা

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

আমাদের প্রান্তিকতা সম্বন্ধে তো কোনো সন্দেহই নেই- না আমাদের নিজেদের মনে, না তাদের ধারণার ভেতর, যারা আমাদেরকে প্রান্তিক করে রেখেছে। কারা প্রান্তিক করলো? অবশ্যই বাইরের লোকেরা। তারা আমাদেরকে কোণঠাসা করেছে। সেটা যে কেবল অতীতের ব্যাপার তা নয়, সত্য তা বর্তমানেও।

প্রান্তিক হলে সুখও আছে। ওই যে মৎস্য ধরিব খাইবো সুখে! কিন্তু মাছও এখন আগের মতো পাওয়া যায় না। নদী-নালা শুকিয়ে গেছে। শুকরগুলো জীর্ণ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বলছে, সামান্য সামান্য আকাঙ্ক্ষার পুষ্টি বর্ধন মগ্ন থাকাটায় সুখ আছে আশা করা যায়, জগৎ থাকুক জগতের মতো, আমি বরঞ্চ পাশ ফিরে শুই- এইভাবে থাকাটা মন্দ নয়। কিন্তু জগৎ তো সেভাবে থাকতে দেয় না। ত্যক্ত-বিরক্ত করে, খোঁচায়। চায়- আরো প্রান্তে ঠেলে দেবে। তাতে মুশকিল হয়।

বাণিজ্য আসে। আসে সাম্রাজ্যবাদ। বলে, শুয়ে শুয়ে ঘোমাবে তা হবে না। ওঠো। আমাদের পণ্যের ক্রেতা হও, সেবক হও আমাদের স্বার্থের জায়গা ছেড়ে দাও, যা কিছু সম্পদ আছে তোমাদের- মটিতে মাটির নিচে কিংবা পানিতে তা তুলে দাও আমাদের হাতে।

কিন্তু এই যে প্রান্তিক বলছি, এই প্রান্তিকতার সংজ্ঞাটি কী? কাকে বলবো প্রান্তিক? প্রান্তিক হচ্ছে সে, কেন্দ্র থেকে যে অনেক অনেক দূরে। যেমন ভৌগোলিকভাবে আমরা প্রান্তিক। পড়ে আছি পৃথিবীর এক কোণে। কিন্তু ওই যে ইংল্যান্ড, এককালে জগৎ শাসন করতো, শাসন করতো আমাদেরকেও, সেও তো এক কোণেরই দেশ, দ্বীপ মাত্র, মস্ত সমুদ্রের বুকে। সেই ইংল্যান্ড প্রান্তিক নয়, আমরা প্রান্তিক কেন? কারণ হচ্ছে ক্ষমতা। যার ক্ষমতা আছে এবং নিজের ক্ষমতা যে অন্যের ওপর প্রয়োগ করতে পারে, সে-ই হলো কেন্দ্র। যত বেশি ক্ষমতা তত বেশি কেন্দ্রীয় হওয়া। আর যার ওপরে যত বেশি ক্ষমতা প্রয়োগ তত বেশি প্রান্তে। স্বভাবতই।

খোদ আমেরিকাও এক সময় সবচেয়ে প্রান্তেই ছিল, যখন সে ছিল অনাবিষ্কৃত; তার পরেও তাকে অনেক দিন প্রান্তিক বলেই বিবেচনা করা হতো। যখন সে ছিল বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতির উপনিবেশ। কিন্তু এখন আর নেই। আমেরিকা স্বাধীন হয়েছে, ক্ষমতাবান হয়েছে এবং সারা বিশ্বের ওপর কর্তৃত্ব করছে। এখন সে হচ্ছে কেন্দ্র, অন্যরা বিভিন্ন পরিমাণে প্রান্তিক। আমরা তো অত্যন্ত অধিক মাত্রাতেই প্রান্তিক। ব্যাপারটা তা-ই ভূগোলের নয়, অর্থনীতির বটে। এবং অর্থনীতির কারণেই রাজনৈতিকও।

ক্ষমতার আসল উৎসটা হলো বাণিজ্য। উপনিবেশবাদ যাকে বলা হয় আসলে সে বাণিজ্যবাদ বৈ অন্য কিছু নয়। বাণিজ্যের জন্য ইউরোপীয়রা জাহাজ ভাসিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। জলদস্যুপনা করেছে, ভূমি দখল করেছে। তখন অবশ্য বাণিজ্যের ব্যাপারটাকে মনে করা হতো ভিন্ন রকমের ব্যাপার। কাঁচামাল সংগ্রহ, বাজার তৈরি, পণ্য বিক্রি, মানুষ কেনাবেচা- সবকিছুই ছিল বাণিজ্যর অন্তর্গত। ভদ্রতা বলে কিছু ছিল না। দখলদারেরা বন্দুকের জোর কাজে লাগিয়েছে, হত্যা করেছে মানুষ, দখল করেছে ভূমি, উসকানি দিয়েছে গৃহযুদ্ধের। জাহাজ বোঝাই করে মানুষ নিয়ে গেছে বন্দরে বন্দরে বিক্রি করবে বলে।

এখন ব্যাপার কিছুটা ভিন্ন। কিন্তু মর্মবস্তুতে তো কোনো বদল ঘটেনি। বাণিজ্য এখনো ওই লুণ্ঠনই। বাণিজ্যের প্রয়োজনে যুদ্ধ চলছে। ঘটছে আগ্রাসন। স্থানীয় সম্পদ নিজের দেশে নিয়ে যাওয়া, স্থানীয় বাজারে নিজেদের পণ্য বিক্রি করা- এসবের তো ঘাটতি নেই। কাজটা চলে ছদ্মবেশে, ভদ্রতার বিভিন্ন প্রকার আবরণে। এমনকি দাস প্রথাও শেষ হয়নি। প্রান্তিক দেশগুলো থেকে মানুষ তো নিয়ে যাওয়া হচ্ছে পুঁজিবাদী বিশ্বে। পার্থক্য অবশ্য একটা আছে। সেটা এই যে, এখন আর জোর খাটাতে হয় না, যারা যায় স্বেচ্ছায় রওনা দেয়, এবং ঢুকতে না পারলে অর্থাৎ দাস হবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলে নিজেদেরকে চরমভাবে ভাগ্যহত মনে করে। কেউ কেউ তো প্রবেশের সুযোগের জন্য প্রাণ পর্যন্ত বাজি রাখে। আরো একটা ছোট পার্থক্য রয়েছে। সেটা এই যে, কেবল অদক্ষ শ্রমিক নয়, দক্ষ, অশিক্ষিত মানুষও পাগল হয় যাবার জন্য। এমনি বাধ্যবাধকতা। কিন্তু এই ব্যবস্থাটা তো প্রাকৃতিক নয়, সম্পূর্ণ অর্থনৈতিকই। পুঁজিবাদী দেশে যে নারী বিক্রির জন্য অন্য কিছু পায় না, নিরুপায় হয়ে সে আপন দেহ বিক্রি করে লোলুপ ক্রেতাদের কাছে। অসহায় নারীকে তখন বলা হয় যৌনকর্মী, যেন তার কাজটা আর পাঁচজন শ্রমিক-কর্মচারীর মতোই, মজুরির বিনিময়ে শ্রম বিক্রি যেন ওই কাজে মেয়েরা স্বেচ্ছায় যায়। যেন ট্রেড ইউনিয়ন গড়বার অধিকার দিলেই তাদের দিক থেকে দুঃখের অন্য কোনো কারণ থাকবে না। এটা হচ্ছে নতুন ভদ্রতা। এটা আগে ছিল না। আগে লুণ্ঠন লুণ্ঠনই ছিল। তাকে উন্নতিতে সাহায্য করা। দারিদ্র্য বিমোচনের চেষ্টা, বাজার উদারীকরণ, আধুনিকায়ন ইত্যাদি বলা হতো না। মেয়েদের দেহ বিক্রি হলো অর্থনৈতিক প্রান্তিকতার চরম নিদর্শন। ভিক্ষুকেরাও প্রান্তিকই কিন্তু তুলনামূলকভাবে কিছুটা কম।

ইংল্যান্ড যদি সমুদ্রে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে অপারগ এবং সেই কারণে উপনিবেশ স্থাপনে ব্যর্থ হতো, উল্টো যদি এমন হতো যে আমাদের বঙ্গভূমিই সমুদ্র ও বাণিজ্যে বিশ্বজয়ী হয়েছে, জয় করেছে ইংল্যান্ডকেও, তাহলে আমরাই হতাম কেন্দ্র আর ওই দেশ হতো প্রান্ত। কিন্তু আমরা পারিনি। না-পারার কারণ সমুদ্র ব্যবহারে এবং বাণিজ্য প্রসারে আমাদের অসমর্থতা।

আমাদেরও তো সমুদ্র ছিল। জাহাজও ছিল। সমুদ্রপথে সওদাগররা বাণিজ্যে বের হয়েছে, এমন খবরও আছে। তারা দূর দূর দেশে গেছে, লঙ্কা জয় করেছে, শুনেছি আমরা। কিন্তু সেটা প্রাচীনকালের ব্যাপার, আধুনিক যুগে সমুদ্র আর আমাদের দখলে থাকেনি। আমাদের সমুদ্র অন্যরা নিয়ে গিয়েছে। জলদস্যু হার্মাদ, বম্বেটে এবং ব্যবসায়ীরা এসেছে বাইরে থেকে। এসে সমুদ্রের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে বাঙালিকে দিয়েছে কোণঠাসা করে। সেই যে সমুদ্র হাতছাড়া হলো, এখনো তাকে ফেরত পাইনি। সেটা মস্ত একটা কারণ আমাদের এই প্রান্তিকতার।

সবচেয়ে ধুরন্ধর ও অগ্রসর ব্যবসায়ী ছিল ইংরেজরা। তারা ব্যবসায়ী হিসেবে এসে রাজ্য স্থাপন করলো, এবং ছলেবলে কৌশলে কেবল বাংলা নয়তো সমগ্র ভারতবর্ষকেই নিয়ে নিলো নিজেদের অধীনে। বাণিজ্যের উপযোগী সামগ্রী বাংলায় উৎপন্ন হচ্ছিল বৈকি। নইলে ব্যবসায়ী ইংরেজ এলো কেন? বস্ত্র ছিল, চাল, লবণ, মসলা -এসব উৎপাদিত হতো। মাটির নিচে ছিল খনিজসম্পদ। উপরে সুযোগ ছিল নীল, চা ও পাটের। এসব দ্রব্য বাঙালি নিজে যে

বিদেশে পাঠাবে, বিক্রি করে দেশে সমৃদ্ধি আনবে, তেমন দেশপ্রেম তাদের মধ্যে ছিল না। অন্তরায় ছিল সামাজিকও। সেন বংশের রাজাদের আমলে দেশ শাসন করতো। তুর্কি আগমনের পর তারা শাসন ক্ষমতা হারালো ঠিকই, কিন্তু সামাজিক ক্ষমতা ধরে রাখলো। আর নিজেদের সেই ক্ষমতা যাতে বিঘ্নিত না হয় সে জন্য অন্যান্য কাজের মধ্যে এটাও বলে দিলো যে সমুদ্র যাত্রা হবে অমার্জনীয় পাপ। সমুদ্রগামীদের ভয় করাটা তাদের দিক থেকে মোটেই অযৌক্তিক ছিল না। সমুদ্রে যে যাবে সে তো আর সামাজিক শাসনের মধ্যে থাকবে না। তার চোখ যাবে খুলে, দুনিয়াটা যাবে বড় হয়ে। তারচেয়েও বড় বিপদের আশঙ্কা ছিল ব্রাহ্মণরাই সওদাগরিকে নিয়ে। সওদাগরপুত্র তো এক সময় রাজপুত্রের কাছাকাছি ছিল, ধনসম্পত্তির কারণে। সেটা গল্পকাহিনীর ব্যাপার। বাস্তব জগতে যদি সওদাগররা ধনদৌলত নিয়ে এসে হাজির হয়, তাহলে বিত্তখোয়ানো ব্রাহ্মণকে তারা মান্য করতে যাবে কোনো দুঃখে।

সমুদ্রযাত্রা তাই কেবল নিষিদ্ধ করা হয়নি, ব্রাহ্মণরা পারলে সওদাগরদের দেশছাড়া করতো, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের যেভাবে তাড়িয়েছিল, অনেকটা সেভাবেই।

বণিকদের সামাজিক মর্যাদা ছিল সামান্য। অভিধানে দেখছি তাদেরকে সাধু-সন্ন্যাসী পর্যন্ত বলা হয়েছে, কিন্তু পাশাপাশি দেখা যায় সেকালে সুদখোরদেরকেও সাধু নাম দেওয়া হয়েছিল। সবটাই মনে হয় অবজ্ঞাসূচক। এখন অবশ্য সমাজে বণিকেরা বেশ প্রতিষ্ঠিত এবং সম্মানিত । তার কারণ আছে। এখন আর বংশে কুলায় না, টাকা দরকার হয়। টাকাই শাসন করে। বণিকদের হাতে টাকা আছে, কাজেই তারা নিজেরাই যে শুধু মর্যাদাবান হয়েছে তা নয়, অন্যদেরকে মর্যাদা দান করবার ক্ষমতাও অর্জন করেছে।

ব্যবসার সঙ্গে বাণিজ্যের অবশ্য একটা পার্থক্য আছে। ব্যবসা জিনিসটা ছোট, বাণিজ্য বড়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যে এসেছিল সেটা ঠিক ব্যবসা নয়, বাণিজ্য করবার জন্যই। বাণিজ্যের ভেতর আমদানি-রপ্তানি থাকে। ওদিকে ব্যবসার ঝোঁকটা হলো দোকানদারির। আমাদের বণিকেরা মূলত ব্যবসাই করেন, আমদানি-রপ্তানি যেটুকু তা অনেকটা একপাক্ষিক, আমদানি অনেক বেশি রপ্তানির তুলনায়। বণিকেরা সেই গুণে গুণান্বিত নন, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লোকদের ভেতর নানা দোষ থাকা সত্ত্বেও যা বেশ ভালোভাবেই ছিল, যার নাম দেশপ্রেম। দেশপ্রেমের অভাবের দরুন বণিকেরা তাদের মুনাফা তো বটেই, দেশের সম্পদও বিদেশে পাচার করতে ইতস্তত করেন না; তারা চোরাচালানি, ব্যাংক থেকে স্বর্ণ নিয়ে তা হজম করে ফেলা ইত্যাদি কর্মকান্ডে সোৎসাহে জড়িত থাকেন। ওদিকে মোবাইলে ফোনের ব্যবসায়ী তৎপরতার ভেতর দিয়ে প্রবাসী বাংলাদেশীদের রক্তপানি করা ডলার বিদেশে চলে যায়। বৈদেশিক স্বর্ণের সুদ গুণতে গিয়ে মুদ্রা তহবিলে টান পড়ে। ওই স্বর্ণ আনা-নেওয়ার ব্যাপারটাও এক ধরনের ব্যবসা বৈকি। এক কথায় বলতে গেলে, ব্যবসায়ী তৎপরতার দরুন আমাদের নিজস্ব উৎপাদন জোরদার হচ্ছে না। কলকারখানা গড়ে উঠছে না, যা ছিল সেগুলোরও কিছু কিছু বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

২.

সমুদ্র এবং বাণিজ্য হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার সঙ্গে আরো একটি বড় কারণ রয়েছে আমাদের এই কোণঠাসা দশার পেছনে। সেটা হচ্ছে পরাধীনতা। বারবার বাইরে থেকে লোক এসেছে, এসে আমাদের দেশ দখল করে নিয়েছে। এর ফলে আমরা উঠে দাঁড়াতে পারিনি। মেরুদন্ড বাঁকা হয়ে গেছে। আর্য, তুর্কি, পাঠান, মোগল, ইংরেজ, যারাই এসেছে তারা নিজেদেরকে বোঝার মতো চাপিয়ে দিয়েছে জনগণের ওপর, এবং শোষণ করেছে। ওপর থেকে চাপ এবং ভেতর থেকে নিঃস্বকরণ- দুভাবেই স্থানীয় মানুষ প্রান্তিক মানুষে পরিণত হয়েছে। অল্প কিছু মানুষ, যারা শাসকদের কাছ থেকে কিছু অনুগ্রহ সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে। বিনিময়ে শাসকদের শাসনকে নিশ্চিতকরণে সহায়তা দিয়েছে, তারাই শুধু কিছুটা ভালো থেকেছে। জনগণের অবস্থা ভালো হবার সম্ভাবনা ছিল না এবং তারা তা হয়ওনি। সাতচল্লিশের পরে স্বাধীন পাকিস্তানের শাসনকর্তারাও তো চেয়েছিল পূর্ববঙ্গকে কোণঠাসা করে রাখবে।

পরাধীনতার কুফল যে কেবল অর্থনৈতিক তা নয়, মনস্তাত্ত্বিকও। পরাধীন থাকতে থাকতে বাঙালি নিজেকে খুবই ছোট ভেবেছে; তাদের মধ্যে যারা উচ্চাসনে ছিল, অর্থাৎ কি না কাছে ছিল শাসকদের, তারাও হীনম্মন্যতায় ভুগছে। হীনতার বোধটা মস্তিষ্কে চলে গেছে এবং সেখানে আটকা থাকেনি। থাকবার কথাও নয়; পৌঁছে গেছে মেরুদন্ডেও। ওটা যে কেবল বাংলাদেশের ব্যাপারে সত্য তা নয়, একই ঘটনা আফ্রিকায়ও ঘটেছে। সেখানকার শিক্ষিত মানুষের মনও চলে যায় একদা প্রভুর দেশ ইউরোপে। সাম্প্রতিক এক জরিপ বলছে, আফ্রিকার শতকরা তিরিশজন শিক্ষিত পেশাজীবী মানুষ এখন দেশের বাইরে চাকরিবাকরি করছে। এটা অবশ্য আমাদের জন্য কোনো সান্ত্বনার বিষয় হতে পারে না; কেননা, আমরা তো মনে করি যে আমরা সংস্কৃতি ও সভ্যতায় অনেক উন্নত, আমাদের ঐতিহ্য ও অভিজ্ঞতা রয়েছে দীর্ঘকালব্যাপী স্বাধীনতা সংগ্রামের।

পরাধীনতার কারণে রাজনৈতিকভাবে আমরা অংশ হয়ে গিয়েছিলাম বড় সাম্রাজ্যের। যেমন এক সময়ে মোগলদের সাম্রাজ্যের পরে ব্রিটিশদের। অর্থাৎ সেই প্রান্তেই পড়ে থাকা। ইংরেজদের সময়ই আমাদের সময় হয়ে গেছে, তাদের ক্যালেন্ডার অনুযায়ীই আমরা চলি, আমাদের বর্ষপঞ্জিকার খবর কে রাখে! বৈশাখে নববর্ষ, এটা কেবল আমাদের ব্যাপার নয়, উত্তর ও পশ্চিম ভারতের এবং ভারতের বাইরে পূর্ব এশিয়ারও বৈকি; কিন্তু সেই নববর্ষ চাপা পড়ে থাকে ইংরেজি নববর্ষের অন্তরালে।

ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে একদিন বাংলাই ছিল সামনে। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন কেবল বাংলায় সীমাবদ্ধ থাকেনি, সারা ভারতজুড়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের প্রকাশমুখ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু ওই আন্দোলনের অর্জনের মধ্যে বাংলার দিক থেকে প্রান্তের দিকে পেছানোর ঘটনাও জড়িত হয়ে ছিলো। চতুর ইংরেজ বঙ্গভঙ্গ রোধে বাধ্য হলো ঠিকই, কিন্তু ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী আর কলকাতায় রাখলো না, সরিয়ে নিয়ে গেলো দিল্লিতে। তাদের দিক থেকে কৌশলটা ছিল কলকাতা তথা বাংলার গুরুত্ব কমানোর। কলকাতা থেকে রাজধানী দিল্লিতে চলে যাওয়ায় বাংলার রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব কিছু কমলো বৈকি। সে আর ভারতে ব্রিটিশ শাসনের কেন্দ্রে রইলো না। এরপরে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্বও চলে গেলো অবাঙালিদের হাতে। সর্বভারতীয় রাজনীতির নেতা হিসেবে একদিকে গান্ধী, অপরদিকে জিন্নাহ প্রধান হয়ে দাঁড়ালেন; সাতচল্লিশে যখন দেশ ভাগ হয় তখন বাংলার

ব্যবসার সঙ্গে বাণিজ্যের অবশ্য একটা পার্থক্য আছে। ব্যবসা জিনিসটা ছোট, বাণিজ্য বড়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যে এসেছিল সেটা ঠিক ব্যবসা নয়, বাণিজ্য করবার জন্যই। বাণিজ্যের ভেতর আমদানি-রপ্তানি থাকে। ওদিকে ব্যবসার ঝোঁকটা হলো দোকানদারির। আমাদের বণিকেরা মূলত ব্যবসাই করেন, আমদানি-রপ্তানি যেটুকু তা অনেকটা একপাক্ষিক, আমদানি অনেক বেশি রপ্তানির তুলনায়

ভাগ্য নির্ধারণের ক্ষমতা বাঙালির হাতে ছিল না, চলে গিয়েছিল সর্বভারতীয় নেতাদের হাতে। দেশভাগের ফলে এক বাংলা দুই বাংলায় পরিণত হয়ে উভয়েই প্রান্তবর্তী হয়ে গেলো, পশ্চিমবঙ্গ হারিয়ে গেলো ভারতীয় ইউনিয়নে, পূর্ববঙ্গ পূর্ব পাকিস্তানে পরিণত হয়ে পাকিস্তানিদের স্বৈরাচারের অধীনে চলে যেতে বাধ্য হলো।

বাইরের শক্তিগুলো সঙ্গে করে নিজ নিজ ধর্মকেও নিয়ে এসেছিল। এভাবে বাংলায় বৈদিক হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম ও ইসলাম ধর্ম এসেছে; ইংরেজরাও তাদের খ্রিস্টান ধর্ম নিয়ে এসেছিল, কিন্তু তা গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। তবে ইংরেজ তার শাসনের সুবিধার জন্য ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতাকে উসকানি দিয়েছে। ইংরেজ আসার আগে বাংলায় বিভিন্ন ধর্মের মানুষ পারস্পরিক সম্প্রীতির ভেতর বসবাস করেছে, তাদের ধর্ম আলাদা ছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ ছিল না। সাম্প্রদায়িকতা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ঐক্য ভেঙে দিয়েছে এবং স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত পরিণত হয়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাতে। এগুতে গিয়ে আমরা পিছিয়ে গেছি।

শাসকেরা তাদের ভাষাও নিয়ে এসেছে, এবং সেটা চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করেছে জনগণের ওপর। এভাবে সংস্কৃত, ফার্সি, ইংরেজি রাজদরবারের ভাষা হয়েছে, জনগণের ভাষা বাংলাকে উপ-ভাষাই সহ্য করতে হয়েছে। এখন অবিশ্বাস্য শোনাবে, কিন্তু পাকিস্তানি শাসকেরাও তো চেয়েছিল তাদের উর্দু ভাষাকে বাংলা ভাষার ওপরে দখলদার হিসাবে বসিয়ে দিতে। পারে নাই যে তার কারণ অন্য কিছু নয়, বাংলাভাষী জনগণের প্রতিরোধ ভিন্ন।

কিন্তু তারপরেও তো বাংলা ভাষা এখনো প্রান্তেই রয়ে গেছে, কেন্দ্রে উঠে আসতে পারেনি। আদালত, শিক্ষা ও প্রশাসনের উচ্চস্তরে বাংলা চলে না; সমাজের উঁচু উঁচু জায়গাগুলোতে সে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না, তাকে জায়গা ছেড়ে দিতে হয় ইংরেজি শব্দ, বাক্যাংশ এমনকি আস্ত আস্ত বাক্যের অশ্লীল অনুপ্রবেশের জন্য। ওদিকে আবার উৎপাত আছে আকাশ সংস্কৃতির। টেলিভিশনে আমাদের বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানগুলো যে নিম্নমানের তা মোটেই নয়, কিন্তু এ অনুষ্ঠান অন্য দেশের মানুষ দেখে না, আমরা অন্য দেশের অনুষ্ঠানের জন্য দরজা-জানালা একেবারে উন্মুক্ত করে দিয়েছি। ইংরেজি ও হিন্দি এসে দাপট দেখাচ্ছে। নিজের ঘরে বসেই লোকে পরিণত হচ্ছে পরদেশীতে।

এই যে প্রান্তিকীকরণ, এটা শুধু জাতির ব্যাপার নয়, জাতির ভেতরে যে শ্রেণী রয়েছে সেক্ষেত্রেও এটা বিলক্ষণ ঘটছে। প্রান্তে নয়, আমেরিকা তো কেন্দ্রেরও কেন্দ্রে স্থাপিত। মূলধারা তারাই। কিন্তু সেখানেও দরিদ্র মানুষেরা প্রান্তেই থাকে, তা তারা যতই ভোটাভুটিতে অংশ নেবার সুযোগ পাক না কেন। বর্ণবাদও আছে, কৃষ্ণবর্ণের মানুষেরা এখনো মূলধারায় নিজেদেরকে স্থাপন করতে পারেনি। তাদের মধ্য থেকে দু-একজনকে ধরে এনে উচ্চপদে

> **খোদ আমেরিকাও এক সময় সবচেয়ে প্রান্তেই ছিল, যখন সে ছিল অনাবিষ্কৃত; তার পরেও তাকে অনেক দিন প্রান্তিক বলেই বিবেচনা করা হতো। যখন সে ছিল বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতির উপনিবেশ। কিন্তু এখন আর নেই। আমেরিকা স্বাধীন হয়েছে, ক্ষমতাবান হয়েছে এবং সারা বিশ্বের ওপর কর্তৃত্ব করছে। এখন সে হচ্ছে কেন্দ্র, অন্যরা বিভিন্ন পরিমাণে প্রান্তিক**

বসিয়ে বর্ণবাদের সত্যকে অস্পষ্ট করবার যে চেষ্টা করা হয় তাতেই বরঞ্চ ধরা পড়ে যায় বাদবাকিরা কতোটা নিচুতে রয়েছে। নারী-পুরুষের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যও সেখানে অত্যন্ত স্পষ্ট। এমনটা ঘটবেই, কেননা মূল ধারাটি হচ্ছে পুঁজিবাদী এবং সেখানে বৈষম্য
যদি না থাকে তবে পুঁজিব
না, তাসের ঘরের মতো

আমাদের দেশ দরিদ্র
পুঁজিবাদী। এখানেও বৈষম
সত্য। আমরা সবাই প্রান্ত
মধ্যেও গরিব মানুষ দ্বিতীয়
ধর্মীয় সংখ্যালঘুরাও দ্বিতী
শিকার। পাকিস্তান আমলে
শ্রেণীর নাগরিক করেই
বাংলাদেশ আমলেও তা
ভোগে, যার জন্য নী
দেশত্যাগ ঘটছে। আর
তাদেরকে তো আমরা
স্বীকৃতিই দেইনি; দেশের
রাখতে চাইছি, বলছি তার

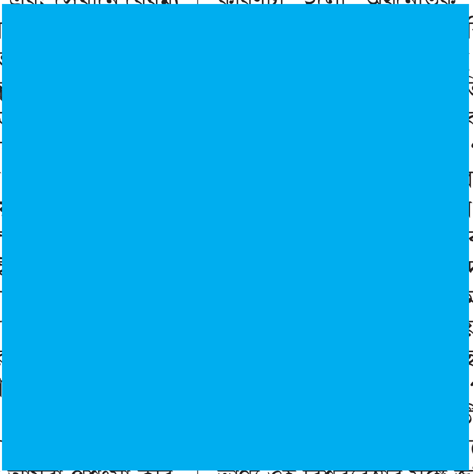

কৃষকের দেশপ্রেমের যতই আমরা প্রশংসা করি, কৃষক যাতে প্রান্তেই থাকে তার ব্যবস্থা বেশ পাকাপোক্তভাবেই করে রাখা হয়েছে। তুলনা করলে দেখা যাবে, উত্তরবঙ্গ প্রান্তিক হয়ে রয়েছে, পূর্ববঙ্গের তুলনায়।

যারা মাদ্রাসায় পড়ালেখা করছে, তারাও ওই শিক্ষার কারণে এবং শিক্ষার মধ্য দিয়েই দ্বিতীয়বার প্রান্তিক হচ্ছে- একবার বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে, আরেকবার মাদ্রাসার ছাত্র হিসেবে। এই শিক্ষায় শিক্ষিতরা শিক্ষার অভিমান এবং দৈহিক শ্রমে অনাগ্রহ অর্জন করে বেশ ভালোভাবেই, কিন্তু কর্মজীবনে প্রবেশ করতে গিয়ে দেখে তাদের জন্য কাজ নেই, তারা দ্বিতীয় মাত্রায় প্রান্তবর্তী হয়ে গেছে। তথাকথিত ইসলামী জঙ্গি নাম নিয়ে যারা সম্প্রতি বোমাবাজি ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপে লিপ্ত হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে, দেখা গেছে যে, তাদের অধিকাংশই এসেছে মাদ্রাসা থেকে। এই খবরে বিস্ময়ের কোনো অবকাশ নেই, এটাই স্বাভাবিক। এদের আচরণ অনেকটা সংঘবদ্ধ ডাকাতদের মতো। ডাকতেরাও ভীষণভাবে প্রান্তবর্তী বৈকি।

৩.

এই যে পাচালি গাইলাম, এর উপসংহার কী? প্রতিকারটা আসবে কোন দিক থেকে?

প্রতিকারের পথনির্দেশটা পাওয়া যাবে প্রান্তিকতার কারণের মধ্যেই। প্রান্তিকতার কারণটা হলো অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক।
বিন্যাসের দরুনই
বিন্যাসটি হলো
তিকারের পথ তাই
বর্তন আনা; এবং
গণতান্ত্রিক করা।
ত্ব সৃষ্টি করে এবং
ধ্য দিয়ে নিজেকে
বাদ পুঁজিবাদেরই
দ আজ একটি
মরা তার অধীনেই
য়েছি। সাম্রাজ্যবাদ
হ।
পরিবর্তন আনা।
কিন্তু তারা
বেদার। তাদের
ভাগ্য ওই বিশ্বব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত। তাই তাকে রক্ষা করতে চায়। সে জন্যই পরিবর্তনটা এদেরকে ক্ষমতায় সুপ্রতিষ্ঠিত রেখে আসা সম্ভব হবে না। পরিবর্তন এমনি এমনি ঘটবে না, তার জন্য আন্দোলন দরকার হবে। সুগঠিত অথচ স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন।

এই আন্দোলন হবে একই সঙ্গে আমাদের স্থানীয় শাসক শ্রেণী এবং তাদের বহির্দেশীয় মুরব্বিদের বিরুদ্ধে। অর্থাৎ তার যেমন একটি স্থানীয় চরিত্র থাকবে, তেমনি থাকবে আন্তর্জাতিক রূপ। বিশ্বজুড়ে আজ পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মানুষের বিক্ষোভ আন্দোলনের আকার নিতে যাচ্ছে। তাতে আমরাও থাকবো, আমাদের মুক্তির প্রয়োজনে।

দেশে আমরা একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা চাই। গণতন্ত্রের মূল কথাটা হচ্ছে অধিকার ও সুযোগের সাম্য। এই সাম্যের জন্য প্রয়োজন ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও প্রতি স্তর এবং পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিদের শাসন। অর্থাৎ কেন্দ্র-প্রান্ত বিভাজনকে অসম্ভব করে তোলা।

আমরা নিশ্চয়ই প্রান্তে আর থাকতে চাই না। আন্দোলন করাটা তাই অপরিহার্য।